এই আড়াই লক্ষ কোথায় যাবে?

১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় চার বোর্ডে পাস করেছে ১,৮৫,৯৭৭ জন। ফেল করেছে ২,৪৭,৫০৬ জন। অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীই এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সাফল্যের আনন্দে এক দিকে যেমন বহু কিশোর কিশোরীর মুখ উজ্জ্বল, পিতামাতা আনন্দে উদ্বেল, মিষ্টি দেয়া নেয়ার পালা চলছে। অন্য দিকে তেমনি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠের মুখই মলিন।

প্রায় এগার কোটি মানুষ অধ্যুষিত একটি জনপদে 'মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে মাত্র চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছাত্রছাত্রী। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তা দশমিক ৪ শতাংশও নয়। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার বিশাল অংশই পড়ে আছে শিক্ষা ব্যবস্থার সীমিত আওতার বাইরে।

নানা বাধা-বিপত্তি ঠেলে আমাদের দেশের খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই এসএসসি পরীক্ষার পর্যায় পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে। এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষিত মানুষ হিসাবে সার্টিফিকেট বা, স্বীকৃতি অর্জনের প্রাথমিক ধাপ। এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই কেবল উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে পা রাখা সম্ভব। এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে যেমন কলেজে ভর্তি হওয়া যায় তেমনি ছোট-খাট একটা চাকরির চেষ্টাও করা যায়। এসএসসি পরীক্ষার পর চার থেকে ছয় বছর পড়াশোনা করলে তারপর উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়। সেই এসএসসি পরীক্ষায়ই মাত্র চার লাখ তেত্রিশ হাজার কিশোর কিশোরী এবার অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আবার উত্তীর্ণ হয়নি। যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজার। অর্থাৎ এই ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী ছাড়া বাকীরা ভাল কলেজে ভর্তি হবার কিংবা ভাল কাজে যোগ দেবার সুযোগ পাবে না। যারা প্রথম বিভাগে পাস করেছে তাদের সবাই যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে সেই সম্ভাবনাও সুনিশ্চিত নয়।

সে যা-ই হোক। যারা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা নানাভাবে কিছু একটা পথ খুঁজে নেবে। কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে, কেউবা পাবে না। কেউবা সাফল্যের উজ্জ্বল আলোয় বিধৌত হবে, কেউবা ব্যর্থ জীবনের বোঝা টেনে চলবে।

আমাদের আসল প্রশ্ন সেই আড়াই লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নিয়ে যারা এবার পাস করতে পারেনি। প্রশ্ন অনেক। কি কারণে তারা পাস করেনি? সে কি শুধু মেধার অভাব, মনোযোগের অভাব, যত্নের অভাব নাকি আরও অনেক কিছু?

পৃথিবীর সকল দেশেই ভাল ছাত্র এবং মন্দ ছাত্র আছে। মেধাবী মাঝারি এবং অমেধাবী সব ধরনের মানুষ নিয়েই সমাজ। মেধার জোরে কেউ কেউ খুব উপরে উঠে যায়। মেধার অভাবে কেউ বা আবার খুব নিচে পড়ে থাকে। কিন্তু এই ওপরে ওঠা কিংবা নিচে পড়ে থাকা সবটুকুই মেধার জন্য নয়। সমান সুযোগ, সমান সুবিধা, সমান যত্ন এবং সমান প্রতিযোগিতা হলে, সমাজে একটা কথা আছে সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেয়া হলে তারপর বলা যেত জীবনের ওঠা-পড়ায় মেধা, নিষ্ঠা ও শ্রমের ভূমিকা কতটুকু।

এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট শীটে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে, চিহ্নিত কয়েকটি ভাল স্কুল চমৎকার ফল করেছে। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলি তুলনামূলকভাবে চমকপ্রদ সাফল্যের অধিকারী। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি খুবই খারাপ করেছে। এমন বেশ কিছু সংখ্যক কেন্দ্র আছে যেখান

ভাবনাকাল

থেকে একজন ছাত্রও পাস করেনি। এমন বহু স্কুল আছে যেখান থেকে একজন ছাত্রও প্রথম বিভাগে পাস করেনি। এমন বহু কেন্দ্র আছে বেদম নকলবাজির জন্য কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে।

এবারকার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার নিয়ে নানা ধরনের কথা শোনা গেছে। কড়া নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেয়ায় এবার নাকি স্বাভাবিক পাসের হার খুবই কম ছিল, অর্থাৎ নকলবাজির মাধ্যমে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় পাসের হারকে বিশেষ স্ফীত করে তুলতে পারেনি। আরও শোনা গেছে, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নাকি জোড়াতালি দিয়ে পাসের হারকে কিছুটা উন্নত করেছেন। অবশ্য এ ধরনের গুজব সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার হাল হকিকত সম্পর্কে জনসাধারণকে কিছুই অবহিত করেননি। আমরা অবশ্য মনে করি যে, দেশের প্রকৃত শিক্ষার পরিস্থিতি কি তা দেশের প্রতিটি মানুষেরই জানার অধিকার আছে। কারণ রোগের প্রকৃতি জানলেই কেবল চিকিৎসা সম্ভব। ঝাড় ফুঁক আর পানি পড়ার আড়ালে রোগ ঢেকে রাখলে অর্থাৎ দাক্ষিণ্যের নম্বরের আড়ালে অকৃতকার্যতার মাত্রা ঢেকে রাখলে শিক্ষার মান ও মাত্রায় অবনতি কখনই দূর করা সম্ভব হবে না। জোড়াতালি দিয়ে পাস করানোর ব্যাপার অবশ্য নতুন নয়। সেই বৃটিশ আমল থেকেই এ ধরনের একটা ব্যাপার চলে আসছে, তবে স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিন্ন ধরনেরত পদ্ধতি গৃহীত হওয়া উচিত ছিল।

সে যাই হোক। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে। যারা পাস করেছে তাদের সাফল্যের আমরা শরীক। জীবনে তারা প্রতিষ্ঠিত হোক, আমরা এটাই কামনা করি। কিন্তু যারা ফেল করেছে, তাদের জন্য আমরা বেশি ভাবছি। আমরা তাদের বেদনার শরীক। সেই সঙ্গে আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—এই আড়াই লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ কি? তাদের কেউ কেউ হয়ত আগামী বছর আবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। কিন্তু অনেকেই এখানেই শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষার বিষয়টিকে দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয় না বলেই আমাদের ধারণা। স্বতস্ফূর্তভাবে যারা লেখাপড়া করতে পারে তাদের নিয়েই সমাজ চলছে। একটি আধুনিক সমাজের নির্মাণে ও বিকাশে যে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা দরকার সে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নেই। একটি সমাজকে সামনে নিয়ে যেতে হলে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, কারিগর, শিক্ষক, ব্যবসায়ী শিল্পপতি, পরিকল্পনাবিদ, দার্শনিক ও সাধারণভাবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন পড়ে। একটি দরিদ্র সমাজকে পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের পরীক্ষার হাল চাল দেখে মনে হয় না শিক্ষার ব্যাপারে আমরা খুব একটা উদ্বিগ্ন। কেউ পাস করছে কেউ ফেল করছে। আমরা কেউ মিষ্টি খেয়ে কিংবা দুঃখ পেয়ে গোটা বিষয়টি ভুলে যাই। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে।

আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিৎ—এসএসসি পর্যায়ে এসে আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রী কেন ফেল করবে, এই দায়িত্ব কার? হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল ছাড়া আর কোথাও লেখাপড়া হয় না। শিক্ষার্থীরা অসহায়। বই খাতা হাতে নিয়ে তারা স্কুলে যায়, রোল কল হয়, তারা ফিরে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীই জানে না কিভাবে লেখাপড়া করতে হবে কিভাবে পাস করতে হবে। নেই উপযুক্ত শিক্ষক, নেই প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। ঢাকার যে স্কুলটি 'প্রতিটি ছাত্রের প্রতি নজর' রাখতে পেরেছে সে স্কুলের ১৪ জন ছাত্রী মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১৪৩ জন তার মধ্যে স্টার মার্কসে ভূষিত হয়েছে ৯১ জন। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে মাত্র তিন জন। অর্থাৎ প্রতিটি ছাত্রের প্রতি নজর রাখলে তাদের শিক্ষার মান উন্নত করা যায়। কিন্তু দেশের কটি স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক আছেন? কটি স্কুলে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় তাদের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য যত্ন নেয়া হয়?

পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রদের কেউ কেউ বলেছে, তাদের গৃহশিক্ষক ছিল না, কেউবা বলেছে গৃহশিক্ষক ছিল। বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে 'পার্সোনাল কেয়ার' এর নামই হোক আর গৃহশিক্ষকের নামই হোক বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভাল ফল করা সম্ভব নয়। স্কুলের পড়াশুনা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হত, অর্থাৎ প্রতিটি ছাত্র যদি স্কুলে সমান যত্ন পেত, তা হলে হয়ত গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমাদের স্কুলগুলিতে বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলিতে লেখাপড়ার অবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। ভাল রেজাল্টের জন্য 'পার্সোনাল কেয়ার' নেয়া দূরে থাক সেখানে ভালমত লেখাপড়াই হয় না। ছাত্রছাত্রীর যেকোন মতে উত্তীর্ণ হয় সেই অনেক বেশি।

এসএসসি পরীক্ষায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ থেকে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা আবারও পিছিয়ে পড়লাম। আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত হয়ে থাকল, তেমনি তমসা বিস্তৃত হয়ে থাকল গোটা জাতির ভবিষ্যতের ওপর।

আমরা আশা করব, সরকার, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এসএসসি পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্যতার বিষয়টি আমাদের উন্নয়ন ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করে দেখবেন এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের কথা ভাববেন।